বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু ঃ আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার অগ্রপথিক

অভিজিৎ বিশ্বাস

।। এক।।

অনেকদিন আগের রথা। বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ছিল ভগবানচন্দ্র বসু। তাঁদের পৈতৃক বাড়ি অবশ্য ছিল অন্য জায়গায়। ঢাকা জেলার রাঢ়ি খাল গ্রামে। সে সময় ফরিদপুর জেলায় ভয়ংকর ডাকাতের উপদ্রব। যখন তখন তারা আক্রমণ করত। লুটপাট করে নিয়ে যেত সব কিছু। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ভগবানচন্দ্রের উপরেই দায়িত্ব পড়ল ডাকাত দমন করার। তার উপর হাকিমী করার সুবাদে ডাকাতদের সাজা দেওয়ার ভারও ছিল তাঁরই উপর। বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়াই ছিল ভগবানচন্দ্রের স্বভাব। সারা জীবনের বহু ঘটনা তার প্রমাণ। এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না। একবার খালি হাতে এক ডাকাত সর্দারকে পাকড়াও করেছিলেন তিনি। এমনই এক দোদর্ন্ডপ্রতাপ ডাকাতের দল একবার জেলে যাওয়ার সময় তাঁকে শাসিয়ে যায় যে মুক্তি পেলেই তারা এর শোধ তুলবে। যেমন কথা তেমনই কাজ। জেলের থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে সেই ডাকাতেরা একদিন রাতের অন্ধকারে ভগবানচন্দ্রের বাড়িতে লাগিয়ে দিল আগুন। চারিদিকে চিৎকার চ্যাঁচামেচি, পড়শীদের ছোটাছুটি। এর মধ্যে সকলে ভুলেই গেছিল ওই দাউ দাউ আগুনের মধ্যেই খেলা করছিল তাঁর ছোট মেয়ে। সকলের সমস্ত ওজর আপত্তি অগ্রাহ্য করে মৃত্যুর মুখ থেকে মেয়েকে ফিরিয়ে আনলেন ভগবানচন্দ্র। কিন্তু এই আগুন সবস্বান্ত করে দিল তাঁর পরিবারকে। এরপরে প্রায় একমাস প্রতিবেশীদের বাড়িতে বাড়িতে তাদের আশ্রয়ে কাটাতে হয়েছিল ফরিদপুরের এই বসু পরিবারটিকে।

কিন্তু কাহিনি এখানেই শেষ নয়। একবার দীর্ঘদিনের সাজার শেষে এক জেল ফেরত ডাকাত কেঁদে লুটিয়ে পড়ল তাঁর পায়। কি ব্যাপার? না, বয়স হয়েছে। তার উপর জেলখাটা আসামীকে কেউ আর কাজে রাখতে রাজী নয়। 'ও, এই কথা', অদ্ভুত এক উপায়ে সমস্যার সমাধান করলেন ভগবানচন্দ্র। সেই ডাকাতের হাতেই তুলে দিলেন ছেলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার। ভগবানচন্দ্রের বাড়ি থেকে ছেলে জগদীশচন্দ্রের স্কুলের দূরত্ব অনেকখানি। প্রায় গোটা পথটাই সেই জেল - ফেরত আসামীর কাঁধে চড়ে যাতায়াত করত শিশু জগদীশ। ডাকাত সর্দারের সারা গায়ে অজস্র কাটাকুটির দাগ। প্রতিটি দাগের সঙ্গেই জড়িয়ে ছিল এক - একটি কাহিনি। সেই কাহিনি শুনতে শুনতে কখন পার হয়ে যেত পথ। শুধু তাই নয়, উদারমনস্ক ভগবানচন্দ্রের জাত্যাভিমান বলেও কিছু ছিল না। শিশু জগদীশের সঙ্গে একইসাথে শিক্ষাগ্রহণ করত তাঁর মুসলমান আর্দালির ছেলে, অন্যান্য (তথাকথিত) নীচুজাতের ছেলেরাও। সকলে যখন ফিরে আসত স্কুল থেকে, ভগবানচন্দ্রের স্ত্রী বামাসুন্দরী ছোট বড় কোনও ভেদাভেদ না রেখে সকলকে নিজের হাতে পেটপুরে খাইয়ে দিতেন। আজকের দিনে এই ঘটনা হয়ত তেমনভাবে আর আশ্চর্য করে না। কিন্তু সেইসময়ের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলে ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে ভগবানচন্দ্র তাঁর নিজের সময় থেকে কতখানি এগিয়ে ছিলেন।

এইসময় জগদীশচন্দের একটি ছোট ঘোড়াও ছিল। সেই ঘোড়ায় চড়ে তিনি একবার বড়দের সঙ্গে রেসে অংশগ্রহণ করেন। সবাই মিলে হাসিঠাট্টা করলেও পাঁচ বছরের জগদীশ কিন্তু সেদিন ময়দান ছেড়ে পালান নি। ক্ষত - বিক্ষত দেহে পৌঁছিয়ে ছিলেন রেসের শেষ প্রান্তে। পরবর্তীকালে জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় তাঁর যে দৃঢ়চেতা মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, এই ঘটনা ছিল তারই প্রথম যথাযথ প্রকাশ।

আমরা আবার ভগবানচন্দ্রের কথায় ফিরে আসি। আসলে বিজ্ঞানাচার্যের কথা বলতে গেলে তাঁর পিতৃদেবের কথা আমাদের বার বারই বলতে হবে। বড় আলোকিত মানুষ ছিলেন ভগবানচন্দ্র। ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহ শহরে প্রথম যখন সরকারী ইংরেজি স্কুল হয়, তার হেড্‌মাস্টারমশাই ছিলেন ভগবানচন্দ্র। আর ১৮৫৭ সাল কিন্তু শুধুমাত্র সিপাহী বিদ্রোহের জন্য বিখ্যাত নয়। এই বছরেই প্রতিষ্ঠিত হয় পরবর্তীকালে আমাদের গর্বের স্থান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার পরের বছর যে এন্ট্রান্স্ পরীক্ষা হয়, তাতেও কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন তিনি। এই পাশ করার ফলে তিনি হলেন ময়মনসিংহ জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আর ওই বছরেই ৩০শে নভেম্বর বামাসুন্দরীর কোল আলো করে পৃথিবীতে জন্মালেন ভবিষ্যত ভারতের বিজ্ঞান সাধনার পথিকৃৎ মহাবিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। তারপর তাঁর আরও পাঁচ বোন (স্বর্ণপ্রভা, সুবর্ণলতা, লাবণ্যপ্রভা, চারুপ্রভা ও হেমপ্রভা) জন্ম নেয়। একটি ছোট ভাইও ছিল, সে অবশ্য বাঁচে নি বেশিদিন।

ভগবানচন্দ্র ছিলেন কর্মঠ পুরুষ। জগদীশচন্দ্রের যখন দশ বছর বয়স, তখন তিনি বর্ধমান জেলার অ্যাসিস্টেন্ট্ কমিশনার নিযুক্ত হন। সেখানে তখন সাংঘাতিক ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। প্রতি দিনই মারা যাচ্ছেন অগুন্তি মানুষ। ভগবানচন্দ্র তখন সেই সহায়সম্বলহীন মানুষগুলোর জন্য তাঁর সর্বস্ব দিয়ে দিলেন। প্রকোপ একটু কমলে অসহায় মানুষগুলো যাতে অন্তত কিছু করে খেতে পারে তার জন্য গড়ে তুললেন একটি শিল্প শিক্ষালয়। আর এখানেই শ্রমিকেরা বামাসুন্দরীর বাসন গলিয়ে শিশু জগদীশচন্দ্রের জন্য তৈরি করে দিয়েছিলেন ছোট এক পিতলের কামান।

এর ছ'বছর পর ভগবানচন্দ্র বদলি হলেন কাটোয়ায়। কিন্তু এখানেও দুর্ভিক্ষ তাঁর পিছু ছাড়ল না। আবারও জীবন - সর্বস্ব করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রিলিফের কাজে। সারাদিনে খাওয়া বলতে সামান্য একটু ছাতুর সরবত। কিন্তু শরীর তা সইবে কেন? ফলে যা হওয়ার তাই হলো। স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়ল। সেই কারণে কর্মক্ষেত্র থেকে ছুটি নিতে হলো টানা দু'বছর। কিন্তু বিশ্রাম যাঁর ধাতে নেই তাঁকে কি আর ছুটির বাঁধনে আটকানো যায়? উত্তরবঙ্গের তরাইয়ে বেশ খানিকটা জমি কিনলেন, চাষবাসও শুরু করলেন। কিন্তু ব্যবসায় কি করে সফল হওয়া যায়, এই মন্ত্র তাঁর জানা ছিল না। আসামে জমি কিনে স্বদেশী চা - বাগান স্থাপন করলেন। তাতে লাভ তো দূরের কথা, উল্টো চড়া সুদের কারণে আপাদমস্তক দেনায় ডুবে গেলেন। এতেও শেষ নয়। বোম্বাইয়ে (অধুনা মুম্বাই) স্বদেশী সুতাকলের নামে তাঁর স্বদেশী মনোভাব এবং ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে একদল লোক তাঁর বহু টাকা আত্মসাৎ করলেন। কিন্তু ভগবানচন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল এটাই। বার বার ব্যর্থ হয়েছেন, আবার নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। পরবর্তীকালে নিজের পিতৃদেব সম্পর্কে সেই কথাই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন - জগদীশচন্দ্র, ''যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনি অতদিন পূর্বেও দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, শিল্প - বাণিজ্য ও কৃষি উদ্ধার না করিলে দেশের আর কোন উপায় নাই। দেশে যখন কাপড়ের কল প্রথম স্থাপিত হয় তাহার জন্য তিনি জীবনের প্রায় সমস্ত অর্জন দিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রথম পথ - প্রদর্শক হন তাঁহাদের যে গতি হয়, তাঁহার তাহাই হইয়াছিল। বিবিধ নতুন উদ্যমে তিনি বহু ক্ষতিগ্রস্ত হন।... জীবনের শেষ ভাগে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার সমস্ত জীবনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যর্থ? হয়ত একথা তাঁহার নিজ জীবনে প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু সেই ব্যর্থতার ফলে বহু জীবন সফল হইয়াছে। তাঁহার জীবন দেখিয়া

শিখিয়াছিলাম। তখন হইতেই আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল। যদি আমার জীবনে কোন সফলতা হইয়া থাকে, তবে তাহা নিস্ফলতার স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা।"

।। দুই।।

ফরিদপুরের সেই স্কুলের কথা তো আমরা আগেই বলেছি। এরপর ভগবানচন্দ্র যখন আবার বর্ধমানে বদলি হলেন, জগদীশচন্দ্র পাকাপাকি ভাবে চলে এলেন কলকাতায়। ভর্তি হলেন হেয়ার স্কুলে। তবে বেশি দিনের জন্য নয়। হস্টেলের সুবিধার জন্য অচিরেই চলে এলেন সেন্ট জেভিয়াস স্কুলে। ১৮৭৫ সালে এই স্কুল থেকেই প্রথম বিভাগে এন্ট্রাস্ পাশ করলেন। এবার স্কুল থেকে কলেজে প্রমোশন হল। খুব যে আহামরী কিছু একটা রেজাল্ট করেছিলেন তা কিন্তু নয়। প্রথমে ১৮৭৭ সালে এফ. এ এবং তারপরে ১৮৮০ সালে বিজ্ঞান বিভাগে বি.এ পাশ করলেন এই কলেজ থেকেই। দুটি ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত মান হলো দ্বিতীয় বিভাগে। কিন্তু এখানেই গুরু হিসাবে পেয়েছিলেন ফাদার লাফোঁকে (Father Eugene lafont); মূলতঃ তাঁরই পড়ানোর গুণে ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন পদার্থবিদ্যার প্রতি।

হাকিমী করলেও ভগবানচন্দ্র মনে প্রাণে ছিলেন স্বদেশী। চেয়েছিলেন ছেলে কৃষিবিদ্যা পড়ে দেশের সেবায় লাগুক। আর জগদীশচন্দ্র নিজে ছিলেন বিলেত যাওয়ার পক্ষপাতী। পিতা তখন ঋণভারে জর্জরিত, জগদীশচন্দ্র ভেবেছিলেন, যদি বিলেত থেকে একবার আই.সি.এস পাশ ক'রে আসতে পারেন, তাহলে পিতৃঋণ শোধ করতে আর বিশেষ অসুবিধে হবে না। কিন্তু বাধ সাধলেন মা। কিছুদিন আগেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁর ছোট ছেলের। এই অবস্থায় জগদীশচন্দ্রকে কিছুতেই কালাপানি পার হতে দিতে রাজী হলেন না। কিন্তু শেষপর্যন্ত ছেলের আকাঙ্ক্ষার কাছে হার মানলেন। শুধু তাই, নয়, শেষ সম্বল হিসেবে যে সামান্য অলঙ্কারটুকু ছিল সেটিও তুলে দিলেন পুত্রের হাতে। কিন্তু এর মধ্যে, একটু ভাবনার বদল হয়েছে। ঠিক হলো, ব্যারিস্টারী বা সিভিল সার্ভিস পড়তে নয়, জগদীশচন্দ্র বিলেত যাবেন ডাক্তারী পড়ার জন্য। তবে শেষ পর্যন্ত আর মায়ের গয়নার দরকার পড়ে নি। কারণ, তার আগেই ভগানচন্দ্র পুনর্বার চাকরিতে যোগ দিয়েছেন।

বি.এ. পাশের পর আসামের এক বন্ধুর বাড়িতে গেছিলেন জগদীশচন্দ্র। উদ্দেশ্য ছিল শিকার করা। কিন্তু সেখানেই বাধিয়ে বসলেন কালাজ্বর। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী তখনও আবিষ্কার করেন নি এই রোগের ওষুধ। ফলে জ্বর আসতে লাগল কিছুদনি পর পরই। শরীরের এই অবস্থা নিয়েই রওনা হলেন বিলেতে। জাহাজেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেই অসুস্থতা চলতে থাকল লন্ডন পৌঁছাবার পরেও। বিশেষ করে শব ব্যবচ্ছেদের ঘরে ঢুকলেই সে রাতে প্রবলবেগে জ্বর আসত তাঁর। লন্ডন শহরের আবহাওয়াও তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। চলে এলেন কেমব্রিজের গ্রাম্য পরিবেশে। সেখানকার সুবিখ্যাত ক্রাইস্ট্স কলেজে ভর্তি হলেন ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মসে। তিন বছর পড়াশোনার পর পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যায়, 'ট্রিপোস' (Tripose) পাশ করলেন। আর একই সময়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৌলিক গবেষণার জন্য পেলেন বি.এস.সি ডিগ্রিও।

চার বছর পর দেশে ফিরলেন জগদীশ। সঙ্গে ভাইসরয় লর্ড রিপনকে লেখা অধ্যাপক ফসেটের (Fawectt) একটি চিঠি। লর্ড রিপন সেই চিঠির সূত্র ধরে বার্তা পাঠালেন সেই সময়ের বাংলা শিক্ষাদপ্তরের অধিকর্তা স্যতার আলফ্রেড ক্রফটকে যে জগদীশচন্দ্রকে কোনও যথাযোগ্য কাজের নিযুক্তি করা হয়। কিন্তু সেই চিঠি পেয়ে ক্রফট মোটেই খুশি হলেন না। সেই সময় যাঁরা বিলিতি শিক্ষায় শিক্ষিত হতেন, তাঁদের কর্মসংস্থান হতো মূলতঃ ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে। ক্রফট বড় জোর তাঁকে একটি প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে কাজ দিতে রাজী হলেন।। কিন্তু জগদীশচন্দ্র সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন না। এর ফলে বেশ কিছু দিন তাঁকে অপেক্ষা করতে হলো। এরপরেও যখন গেজেটে তাঁর নাম প্রকাশিত হলো না, তখন রিপন নিজেই উদ্যোগী হলেন। কিন্তু শর্ত হলো এই যে, তাঁর এই নিয়োগ হবে অস্থায়ী। এই অবস্থায় তিনি ইউরোপিয় অধ্যাপকদের মাত্র এক তৃতীয়াংশ মাইনে পাবেন এবং স্থায়ী হলেও তাঁর বেতন কখনই ইউরোপীয় অধ্যাপকদের সমান হবে না। হবে তাঁদের বেতনের দুই - তৃতীয়াংশ। কিন্তু জগদীশচন্দ্র কখনই হাল ছেড়ে দেওয়ার মানুষ ছিলেন না। প্রতিবাদে তিনি তিন - তিনটি বছর একটি টাকাও বেতন হিসেবে গ্রহণ করেন নি। বরঞ্চ নিরলস পরিশ্রমে গড়ে তুলেছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরি। অধ্যাপক হিসেবেও তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে ছাত্রমহলে। অন্যান্য অধ্যাপকদের ক্লাস যখন ফাঁকা, তাঁর ক্লাসে তিল ধারণের জায়গা থাকত না। আর ছাত্রদের মধ্যেও ছিলেন কারা? তাঁরাও সব পরবর্তীকালের এক একজন মহাপ্রতিভাধর বিজ্ঞানী। ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকায় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু 'জগদীশচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে নিজের ছাত্রজীবনের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন, ''কিশোর মনের বাসনা এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর কাছে বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারিলে জীবন ধন্য হইবে।...তাঁহার কাছে যে কয়দিন পড়িবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, সে কয়দিনের কথা সারাজীবন স্মরণে থাকিবে।"

জগদীশচন্দ্রের তুলনায় তিন বছরের ছোট ছিলেন আরেক দিকপাল বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। গিলক্রাইস্ট্ বৃত্তি পেয়ে প্রফুল্লচন্দ্র যখন প্রথমবার বিলেত যান, তখন জগদীশচন্দ্রের আতিথ্যেই ছিলেন এই বিজ্ঞানী। পরবর্তীকালে নানা লেখায় ভাষণে বারে বারেই প্রফুল্লচন্দ্রের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবোধ ফুটে উঠেছে জগদীশচন্দ্রের প্রতি। প্রেসিডেন্সি কলেজে দীর্ঘ কর্মজীবনের শেষে তিনি রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে যোগদান করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিদায় সম্বর্ধনার কালে আবেগমথিত কণ্ঠে প্রফুল্লচন্দ্র উচ্চারণ করেছিলেন, ''আমার বন্ধু ও সহকর্মী স্যতার জগদীশচন্দ্র বসু ও আমি গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া একসঙ্গে কাজ করিয়াছি এবং আমি আশা করি যে আমরা যে অগ্নি মৃদুভাবে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছি, তাহা ছাত্র পরম্পরাক্রমে অধিকতর উজ্জ্বল ও জ্যোর্তিময় হইতে থাকিবে এবং অবশেষে তাহা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আলোকিত করিবে।"

তিন বছর পর কর্তৃপক্ষ তাঁকে প্রকৃত মর্যাদা দিতে বাধ্য হলেন। পুরো বেতনে তাঁকে স্থায়ীপদে নিযুক্ত করা হলো। শুধু তাই নয়, এই তিন বছরের পুরো টাকাও তাঁকে একসঙ্গে দেওয়া হলো। কিন্তু এর মধ্যে পারিবারিক জীবনেও বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। ফরিদপুরে থাকার সময় গরীব কৃষকদের সহায়তার জন্য ভগবানচন্দ্র একটি লোন অফিস খুলেছিলেন। পরে এই ব্যাঙ্কটি দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু ভগবানচন্দ্র তাঁর বন্ধুদের মধ্যে নিজের শেয়ারগুলি বিলি করে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর আর লাভের লাভ কিছু হয় নি। এছাড়াও একের পর এক ব্যাবসায় লোকসানের ফলে তিনি ঋণে ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েন। পিতাকে ঋণমুক্ত করার জন্য জগদীশচন্দ্র সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে দেন। বেচে দেন মায়ের দিক থেকে পাওয়া সম্পত্তিও। এরই পাশাপাশি তিন বছরের বেতন হিসেবে একসঙ্গে পাওয়া অনেকগুলি টাকা তাঁকে ভীষণভাবে সাহায্য করেছিল। কিন্তু সেটাই সব নয়। এর পরেও দীর্ঘ ছয় বছর ধরে একটু একটু করে সমস্ত পিতৃঋণ তিনি শোধ করেছিলেন। এই ঋণ শোধ করার এক বছরের মধ্যেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন ভগবানচন্দ্র, মাও গেলেন তার দু'বছরের মধ্যেই।

এরই মধ্যে সংসারে এসেছেন তাঁর স্ত্রী লেডি অবলা বসু। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের কথা বলতে গেলে তাঁর স্ত্রীর কথা না বললেই

নয়। ভগবানচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্ম। শিক্ষায় দীক্ষায় তখন ব্রাহ্ম সমাজের প্রবল প্রতাপ। ১৮৮৭ সালে জগদীশচন্দ্রের বিবাহ হয় ব্রাহ্মসমাজের যশস্বী সদস্য দুর্গামোহন দাসের কন্যা অবলার সঙ্গে। তিনি তখন মাদ্রাজ (অধুনা চেন্নাই) মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী। এক কঠিন সময়ে তাঁর সঙ্গে জগদীশের পরিণয় হয়। স্বামীর জন্য অবলা নিজের সমস্ত শখ - আহ্লাদ ত্যাগ করে সারাজীবন নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করেছেন। মেজাজী স্বামীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়াও তাঁর সমস্ত কাজের প্রতি তাঁকে নজর রাখতে হতো। বন্ধুবান্ধব এবং ছাত্রদের আপ্যায়ন করতে হতো। স্বামীর প্রতিটি বিদেশযাত্রায় তিনি ছিলেন তাঁর ছায়াসঙ্গিনী। একমাত্র শিশুকন্যার মৃত্যু তাঁদেরকে আরও কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। পরে সম্পর্কে ভাগনে অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসুকে তাঁরা পালিত পুত্র রূপে গ্রহণ করেন।

।। তিন।।

এরই মধ্যে এক হুলুস্থুলু কাণ্ড ঘটে গেল প্রেসিডেন্সি কলেজে। সালটি ছিল ১৮৯৪। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ঘরে বসে অধ্যাপক আলেকজান্দার পেডলারের ঘরে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে অদৃশ্য তরঙ্গ পাঠালেন জগদীশচন্দ্র। বিনা তারে প্রেরিত সেই অদৃশ্য তরঙ্গ একাধিক দেওয়াল পার হয়ে গুলি ছোটাল এক পিস্তল থেকে। এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটালেন ১৮৯৫ সালে কলকাতা টাউন হলে। এবারে উপস্থিত বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট্ গভর্নর উইলিয়ম ম্যাকেঞ্জি স্বয়ং। ৭৫ ফুট দূরে অদৃশ্য তরঙ্গ এবার আগুন ধরিয়ে দিল বারুদের এক স্তুপে।

ব্রিটিশ বিজ্ঞনী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (James clerk Maxwell) বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (wava length) তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের (electoro - magnetic wave) অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন, কিন্তু ১৯৮৭ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্তও সেই অস্তিত্ব খাতাকলমেই ছিল, প্রকৃতপক্ষে অপর একজন জার্মান বিজ্ঞানী হেন্‌রিখ হার্ৎজ (Heinrich Hertz) পরীক্ষাগারে শূন্য মাধ্যমে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেখাতে সক্ষম হলেন। এই পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয় নিয়েই ব্রিটিশ বিজ্ঞানী অলিভার লজ (Oliver Lodge) এমন একটি বই প্রকাশ করেন যা সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষন করেছিল। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুও ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। হার্ৎজ প্রথমে যে তরঙ্গগুলি তৈরি করেছিলেন তার দৈর্ঘ্য ছিল ৯৬০ সেমি। পরে তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য কমিয়ে সেগুলি ক্ষুদ্র তরঙ্গে (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাত্রই ৫-৭ মিমি) পরিণত করেন। আর এই কাজে তাঁকে সহায়তা করেছিলেন জামসেদ, খালেক, পুঁটিরামের মত সাধারণ ঝালাইমিস্ত্রীরা। এই ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলির (Short/ micro wave) সাহায্যে তিনি বিভিন্ন আলোক মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক (Refractive index) নির্ণয় করলেন। শুধু তাই নয় অদৃশ্য কম্পনকে একটি মাত্র তলে সমাবর্তন (Polarzation) করার পদ্ধতি বর্ণনা করলেন। এই সমস্ত কাজের একটি সংকলন পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে পাঠিয়ে ছিলেন কেম্‌ব্রিজে তাঁর মাস্টারমশাইদের কাছে। পুস্তিকাটির নাম ছিল, 'Account of Experimental Researches carried out at the Physical Laboratory of the Presidency College'; আন্তর্জতিক বিজ্ঞানী মহলে এই কাজটি ভূয়সী স্বীকৃতি পায়। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন তাঁর কাজের প্রশংসা করেন। প্রকৃতপক্ষে আজকের দুনিয়ায় মাইক্রোওয়েভের যে বিপুল ব্যবহার বিশেষত রাডার এবং সেলফোনে তার সূচনা এখান থেকেই।

১৮৯৬ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.এস.সি সম্মানে ভূষিত করে। যে থিসিসটির জন্য তাঁর এই সম্মান প্রাপ্তি, সেটি হলো 'On measurement of wave lengths of electric rays'; প্রেসিডেন্সির ওই গবেষণাগারেই আচার্য বহুদূরে বার্তা পাঠানোর সম্ভাব্যতা প্রমাণ করেন। আজ আমরা সকলেই জানি বঞ্চনার সেই ইতিহাস। ১৯০৯ সালে wireless telegraphy -র জন্য নোবেল পুরস্কার পান গুলিয়েলসো মার্কোরিজ মার্কনি (১৮৭৪ - ১৯৩৭)। কিন্তু সত্য হল এই যে ১৮৭৯ সালে রয়াল সোসাইটিতে বক্তব্য রাখার সময় জগদীশচন্দ্র যে ডিটেক্টর যন্ত্রটি ব্যবহার করেছিলেন, মার্কনি উদ্ভাবিত যন্ত্রটি ছিল তারই হুবহু নকল। আচার্যের তৈরি এই গ্রাহক যন্ত্রটির নাম ছিল 'কোহেরার'। এই কোহেরার নামটি রেখেছিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী অলিভার লজ। অদৃশ্য তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ যদি কোহেরারের উপর এসে পড়ে তাহলে তা গ্যালভানোমিটারে বিক্ষেপ (deflection) তৈরি করে। কিন্তু লজের যন্ত্রটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, তা একবার মাত্র সাড়া দিয়েই নিস্পন্দ হয়ে যেত। কিন্তু জগদীশচন্দ্র যে কোহেরারটি আবিষ্কার করেন, তা ছিল অনেক উন্নত। তাতে অতি বেগুনী রশ্মি (ultraviolet ray) বা সাধারণ আলোক তরঙ্গের উপস্থিতিও সহজেই নির্ণয় করা যেত। আচার্য এই যন্ত্রটির নাম দিয়েছিলেন Universal Terometer;

এই বিষয়ে ২০০৮ সালের ৩০ শে নভেম্বর 'জগদীশচন্দ্র বসু স্মারক বক্তৃতায়, সিনিয়র মার্কনির পৌত্র অধ্যাপক ফ্রানচেস্কো মার্কনি এ' কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন যে তাঁর দাদুকেই তিনি রেডিও'র একমাত্র আবিষ্কারক মনে করেন না। ("Before Marconi Several individuals had actually devised something that could in retrofspect be called wrieless telegraphy...Oliver Lodge, George Minchin, Earnest Rutfherfoud...J.C.Bosh")। আর বিজ্ঞানী ব্রুনো লাঙ্গে তাঁর 'ফটো এলিমেন্ট গ্রন্থে পরিষ্কার জানিয়েছেন, 'গ্যালেনা' নামক অনুঘটকের ব্যবহারে বিদ্যুৎ তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে। গ্যালেনা; টেলুরিয়াম এবং অন্যান্য খনিজ নির্দেশকের (ডিটেক্টর) আবিষ্কার হয়েছিলে প্রাচ্যে তথা কলকাতায়। এই আবিষ্কারকের নাম জগদীশচন্দ্র বসু, একজন ভারতীয় পদার্থবিদ। বসু এই যন্ত্রটির নাম দিয়েছিলেন 'আলোক কোষ'। এর পেটেন্টও নিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা এবং সারা বুল। কিন্তু এর সময়সীমা অত্যন্ত দ্রুতই শেষ হয়ে যায়। ১৯৭৭ সালে কঠিন অবস্থার পদার্থবিদ্যায় (Solid state Physics) নিজস্ব অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার পান ফ্যান্সিস মট (Neville Frances Mott); তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন, ''J.C.Bosh was at least 60 years ahead of his time...In fact. he had anticipated the existance of p-type and n-type semi-conductors''.

শুধুই তাই নয়, পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Institute of Electronics and Engineers -ও পরিষ্কার জানায়, বেতারবার্তা গ্রাহকযন্ত্রে ব্যবহৃত iron mercury যা মার্কিন ব্যবহার করেছিলেন, তা বসুরই আবিষ্কার। Merconi International Fellowship Foundation এর website -এ স্বয়ং ফ্রানচেস্কো লিখেছেন যে তাঁর দাদু কোনও নতুন কিছু আবিষ্কার করেন নি, যা করেছেন তা হলো পুরোনো প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির বাস্তব সম্মত ব্যবহার। মার্কনি হয়ত খুব বড়মাপের বিজ্ঞানী ছিলেন না, কিন্তু তিনি ওয়ারলেস টেলিগ্রাফের বাণিজ্যিক দিকটি ভালই বুঝতে পেরেছিলেন।

এটাই আসল কথা। যশ অর্জনের যে সৌভাগ্যের দরকার হয় তার কথা যদি আমরা ছেড়েও দিই, মানসিকতার দিক থেকেও যে মার্কনি এবং জগদীশচন্দ্রের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল, ওই মন্তব্য তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। জগদীশচন্দ্র কোনদিন অর্থকে বড় ক'রে দেখেন নি, তাঁর কাছে বিজ্ঞানচর্চা ছিল সাধনা। গবেষণার ফল কুক্ষিগত না রেখে তিনি তাঁকে বার বার সাধারণ মানুষের নাগালে আনতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিলেত থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠির কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। ওই

চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ''একজন অতি বিখ্যাত টেলিগ্রাফ কোম্পানির ক্রোড়পতি মালিক (Proprietor) একদিন টেলিগ্রাফ করিয়া জানাইলেন, দেখা করিবার বিশেষ দরকার। আমি লিখিলাম, 'সময় নাই'। তাঁহার উত্তর পাইলাম, 'আমি নিজেই আসিতেছি'। অল্পক্ষণ মধ্যেই স্বয়ং উপস্থিত, হাতে Patent form। আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, 'আপনি যেন বক্তৃতায় সব কথা খুলিয়া বলিবেন না। 'There is money in it, Let me take out patent for you. You do not know what money you are thnowing away' ইত্যাদি। অবশ্য 'I will only take half share in the profit - I will finance it' ইত্যাদি। এই ক্রোড়পতিটি আরও কিছু লাভ করিবার জন্য আমার কাছে ভিক্ষুকের ন্যায় আসিয়াছে। বন্ধু, তুমি যদি এদেশের টাকার উপর মায়া দেখিতে—টাকা—টাকা কি ভয়ানক সর্বগ্রাসী লোভ। আমি যদি এই যাঁতাকলে একবার পড়ি, তাহা হইলে উদ্ধার নাই। দেখ, আমি যে কাজ লইয়া আছি, তাহা বাণিজ্যের লাভালাভের উপায় মনে করি না। আমার জীবনের দিন কমিয়া আসিতেছে, আমার যাহা বলিবার তাহার সময় পাই না, আমি অসম্মত হইলাম''। এই উক্তির মধ্য দিয়ে যে জগদীশচন্দ্র বসু কথা বলে ওঠেন, তিনি শুধু একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক নন, তিনি একজন সর্বত্যাগী ভারতীয় ঋষি, দার্শনিক, ভারতবর্ষের চিরায়ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক মহান ধারক ও বাহক, এক মহান বিজ্ঞানী, কিন্তু তার চেয়েও অনেক অনেক বড় এক চিরন্তন বিশ্ব - নাগরিক। অর্থের প্রতি আকর্ষণ তাঁর কোনকালেই ছিল না, সারাজীবন দিয়েই তিনি তা প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু একজন পদার্থবিদ হিসেবে তাঁর যে আরও অনেক বেশি স্বীকৃতি পাওয়া উচিত ছিল, আজকের পৃথিবী অবশ্য তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে।

শ্রী দেবীপ্রসাদ রায় লিখেছেন, সঠিক সময়ে সঠিক মূল্যায়ন হলে জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁর জীবদ্দশায় চারবার নোবেল পুরস্কারের দাবিদার হতে পারতেন। কারণ, (১) তিনিই বেতার যোগাযোগের অত্যাবশ্যক যন্ত্রের আবিষ্কর্তা, (২) তিনিই ট্রানজিস্টার তথা সেমিকন্ডাক্টরের আবির্ষ্কতা, (৩) তিনিই ফটোভোল্টেয়িক কোষ - আবিস্কর্তা এবং (৪) তাঁর গবেষণাই আধুনিক কালের সাইবারনেটিক্স এর জন্মদাতা।''

।। চার।।

কিন্তু কেমন পরিবেশ কাজ করতেন বৈজ্ঞানিক জগদীশ? সেই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁক সপ্তাহে ছাব্বিশ ঘন্টা পড়াতে হতো, কেননা অধ্যাপকেরা মাইনে করা শ্রমিক (সুতারং পড়ানোটাই তাঁদের একমাত্র কাজ), তাঁরা গবেষণা করবেন কেন? (তাও আবার একজন ভারতীয়!) সুতারং জগদীশচন্দ্রের গবেষণামূলক কাজকর্মকে কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনদিনই সুনজরে দেখে নি। তাছাড়া সেইসময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণাগার বলতে যা ছিল, তা মাত্র ২৪ বর্গফুটের একটি অপরিসর ঘর। তার সঙ্গে টয়লেটটি ভেঙে জুড়ে দিয়ে জায়গা আর একটু বাড়িয়ে নিয়েছিলেন আচার্য। আর সঙ্গী বলতে কয়েকজন অল্পশিক্ষিত কারিগর। ভগিনী নিবেদিতা মন্তব্য করেছেন, ''I was horrified to find the way in which a great worker could be subjected tgo continuous annoyance and petty difficulties... The college routine was made as arduous as possible for him, so that he could not have the time he needed for investigation.'' শুধু তাই নয় ১৮৯৬ সালে বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালে (Lord Rayleigh) একবার কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি জগদীশচন্দ্রের ল্যাবরেটরিটি পর্যবেক্ষণ করায় কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিট্ পর্যন্ত আনেন। কিন্তু মাথা নীচু করে নতিস্বীকার করা তাঁর ধাতে ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর কাজই হবে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিঃশব্দ প্রতিবাদ।

১৮৯৭ সালের ১৯ শে জানুয়ারী বিলেতে তিনি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিষয় ছিল, ''On the polarization of electric ray'', (এই বিষয়ে প্রথম বক্তৃতাটি তিনি দিয়েছিলেন ১৮৯৫ সালের ১লা মে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে)। সেই বক্তৃতা শুনে উচ্ছ্বাসিত লর্ড র‍্যালে, জেমস্ দীওয়ার, লড কেলভিন প্রমুখ গুণমুগ্ধের দল ভারত সরকারকে প্রস্তাব পাঠালেন যে সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্রকে একটি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি বানিয়ে দিক। কিন্তু সেদিন তাঁর এই স্বপ্ন পূরণ হয় নি। তাঁর সার্থক ল্যাবরেটরির স্বপ্ন সফল হয়েছিল ১৯১৪ সালে। কিন্তু ততদিনে জগদীশচন্দ্রের কার্যকাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তবে সেদিন কাজের কাজ একেবারেই কিছু হয় নি, তা নয়। জগদীশচন্দ্রকে তাঁর গবেষণার জন্য বার্ষিক আড়াই হাজার টাকার একটি বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া এও জানানো হয়, গবেষণার জন্য এ যাবত জগদীশচন্দ্রের যে খরচখরচা হয়েছে, সরকারবাহাদুর তাও মিটিয়ে দেবেন। কিন্তু চিরউন্নত শির জগদীশচন্দ্র এবারও জানালেন, আগেকার খরচ তিনি কিছুই গ্রহণ করবেন না। ল্যাবরেটরি নিয়ে তাঁর আক্ষেপ হয়ত ছিল, কিন্তু তাঁর চেয়েও অনেক বেশি ছিল নিজের উপর বিশাস, পরাজয়ের মানসিকতা কখনও তাঁকে গ্রাস করে নি। তরুণ গবেষকদের উদ্দেশ্যে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ''সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণ বিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। একথা যদিও অনেক পরিমাণে সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত তাহা হইলে অন্য দেশে যেখানে পরীক্ষাগারর নির্মানে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, সে স্থান হইতে প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে সত্য, কিন্তু পরের ঐশ্বর্যে আমাদের ঈর্ষা করিয়া লাভ কি? অবসাদ ঘুচাও। দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। মনে কর, আমরা যে অবস্থায় পড়ি না কেন সেই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে সে-ই বৃথা পরিতাপ করে।''

।। পাঁচ।।

'অব্যক্ত' গ্রন্থের একটি জায়গায় জগদীশচন্দ্র লিখেছেন, ''তাহার পর আরও দু-একটি অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা আমার বিরুদ্ধ পক্ষ ছিলেন তাঁহাদেরই মধ্যে একজন আমার আবিষ্কার পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।... এই সকল স্মৃতি অতিশয় ক্লেশকর।'' হয়ত খানিকটা সে কারণেই এবং কলেজ কতৃপক্ষের তীব্র অসহযোগিতায় মোটামুটিভাবে ১৯০০ সালের পর থেকে জগদীশচন্দ্র সাবেক পদার্থবিদ্যার পথ ছেড়ে উদ্ভিদবিজ্ঞানে মনোনিবেশ করেন। এটা আমাদের লজ্জা যে আজও বহু স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞান বইয়ে এ'কথা জ্বল্ জ্বল্ করছে যে জগদীশচন্দ্রই প্রথম প্রমাণ করেছিলেন, গাছেরও প্রাণ আছে, আর পাঁচটা প্রাণীর মতো তারও জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু হয়। সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই মানুষ সে কথা জানত। বস্তুত জগদীশচন্দ্র তাঁর পরীক্ষা - নিরীক্ষায় প্রমাণ করেন, অন্যান্য জীবের মতো গাছও উত্তেজনায় সাড়া দেয়। তারও উদ্দীপনা এবং অবসাদ আছে। পটাসিয়াম সায়ানাইড প্রয়োগ করলে প্রাণীর মতো গাছেরও মৃত্যু ঘটে।

এইপ্রসঙ্গে আমরা একটা গল্প বলব। অবশ্য গল্পই বা কেন, আপাদমস্তক সত্য কাহিনি, তবে শুনলে গল্পের মতই লাগে। প্রখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নাড শ জীবহত্যা করবেন না বলে নিরামিষভোজী ছিলেন। একবার তিনি জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগারে এসেছিলেন

এবং সেখানে এসে যা দেখলেন, তাতে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন, যে বাঁধাকপির রোস্ট্ তাঁর সবচেয়ে প্রিয়, সিদ্ধ করার সময় যন্ত্রণাদগ্ধ হয়ে সেগুলি কেমন আচরণ করে, তা দেখতে দেখতে তাঁর দু'চোখ জলে ভরে এল। তিনি তাঁর সমস্ত গ্রন্থাবলী জগদীশচন্দ্রকে উপহার দিয়ে তাতে লিখে দিলেন, ''From the least to the greatest biologist'', আর রোমাঁ রোলাঁ লিখেছিলেন, ''To the Revealer of a new world''।

তবে জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কার যে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়নি, তা নয়। প্রশ্ন উঠেছিল তাঁর আবিষ্কৃত 'ক্রেস্কোগ্রাফ' (Crescograph) যন্ত্রটি নিয়েও। এমন কথাও বলা হয়েছিল, বৈজ্ঞানিক বসু উদ্ভিদের যে সংবেদনশীলতার কথা বলছেন, প্রকৃতপক্ষে তা হলো ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রটিরই কারসাজি এবং তিনি যেন তাঁর গবেষণাগারে নয়, অন্য কোথাও যন্ত্রটির কার্যকারিতা প্রমাণ করে দেখান। আচার্য সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানালেন। কারচুপি তো দূরে থাক সমবেত বিজ্ঞানীরা যন্ত্রের কার্যকারিতা ও সংবেদনশীলতা প্রত্যক্ষ করে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। বিখ্যাত 'নেচার'পত্রিকা এ'সময়ে তাঁর উপরে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করে। বসু উদ্ভিদ বিষয়ক যে থিসিস পেপারগুলি প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলিকে কালানুক্রমিক ভাবে সাজালে— 1) Response in the Living and Non-Living,m 1902, 2) Plant response as a means of physioloical investingation, 1906, 3) comparative Electro - physiology. A. Physico physiological study 1907, 4) Researches on Irritability of plants, 1913, 5) Physiology of the Ascent of Sap, 1923, 6) The Physiology of photosynthesis, 1924, 7) The Nervous Mechanisms of Plants, 1926, 8) Plant Autographs and theri Revealations, 1927, 9) Growth and tropic movements of Plants, 1928, 10) Motor mechanism of plants, 1928।

।। ছয়।।

১৮৯৪ সালের ৩০ শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের জীবনে এটি একটি উল্লেখযোগ্য দিন। কারণ জন্মদিনের এই ছত্রিশতম বার্ষিকীতেই জগদীশচন্দ্র নিজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে জীবনের বাকি দিনগুলো তিনি সর্বাংশে বিজ্ঞানের সেবায় উৎসর্গ করবেন। আর তার চেয়েও অনেক বেশি স্মরণীয় হয়ে থাকবে ১৯১৭ সালের ৩০ শে নভেম্বর, তাঁর ঊনষাটতম জন্মদিন। কারণ, ওই দিনই যাত্রারম্ভ হয় তাঁর সারাজীবনের স্বপ্ন ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীন বিজ্ঞান গবেষণাগার 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' -এর।

১৮৮৭ সালে ব্রিটেনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় থেকেই জগদীশচন্দ্র ননে মনে এই স্বপ্ন দেখা শুরু করেন। লেডি অবলা বসু লিখেছেন, ''বয়াল ইনস্টিটিউশনের কর্মপদ্ধতি দেখিয়া তখন হইতেই আমাদের দেশে এরূপ কোনও স্থান করিবার বাসনা আমার স্বামীর মনেও উদয় হইল এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সূচনা ও কল্পনা তখন হইতেই আরম্ভ হইল''। কুড়ি বছর পর সেই স্বপ্ন সফল হবার কালে জগদীশচন্দ্র অবশ্য বলেন, ''Twenty years sgo, I spent many days there (Nalanda) in close Communion with the past. It was there that I drew my inspiration for the foundation of my Institute to revive once more the great traditions of Nalanda and Taxila''।

ঠিক কুড়ি বছর আগে আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল, কথা উঠেছিল, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটারিকে তাঁর নিজস্ব গবেষণাগার বানিয়ে তুলেছেন। তাই লর্ড র‍্যালে ছুটির দিনে তাঁর গবেষণাগার দর্শন করায় তাঁকে 'শো-কজ' নোটিশ ধরানো হয়েছিল। সেদিন তাঁর সেই গবেষণা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতে এগিয়ে এসেছিলেন কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ। ত্রিপুরার রাজা মহিমচন্দ্র দেববর্মনের কাছে সাহায্য চেয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন কবি। সেদিন যা সম্ভব হয় নি কুড়ি বছর পরে তা সম্ভব করে দেখিয়েছিলেন জগদীশ, আর সেই বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধন সঙ্গীত রচনা করেছিলেন আচার্যের অভিন্নহৃদয় বন্ধু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শেয়ালদার কাছে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের পাশে গড়ে উঠল 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'। আচার্য দিয়েছিলেন তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় — প্রায় বার লক্ষ টাকা। আর এই কাজের প্রেরণাদাত্রী হিসেবে আরও একজনের ভূমিকা অনস্বীকার্য, এ'দেশে না জন্মেও তিনি এ'দেশকেই তাঁর নিজের দেশ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন তিনি ভগিনী নিবেদিতা। ১৯১১ সালে তাঁর জীবনাবাসন হয়। কিন্তু জগদীশচন্দ্র তাঁর পুণ্য স্মৃতিকে চির জাগরূক করে রেখে দিলেন মন্দিরের প্রবেশদ্বারে প্রাচীরের গায়ে দীপহস্তে একটি নারীমূর্তি খোদাই করে। এই ভাস্কর্যটির স্রষ্টা ছিলেন আচার্য নন্দলাল বসু।

।। সাত।।

জগদীশচন্দ্র খুব বেশি সাহিত্যরচনা করেন নি। রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিগুলি বাদে গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁর মোট রচনার সংখ্যা চল্লিশের বেশি নয়। কিন্তু তাতেই তার রচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। একদা বিখ্যাত 'প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজ জগদীশচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন। শ্রী চট্টোপাধ্যায় একসময় 'দাসী' নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'ভাগিরথীর উৎস সন্ধানে'। তাঁর অধিকাংশ ছড়ানো ছিটানো রচনা ১৯২১ সালে 'অব্যক্ত' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ পাঠ করে উচ্ছ্বসিত রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন, ''যদিও বিজ্ঞানবাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ, তবু সাহিত্য সরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত; কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে।'' মূলত কবিরই উদ্যোগে ১৯১১ সালে ময়মনসিংহের বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞানী জগদীশ। সেখানে সভাপতির ভাষণে 'বিজ্ঞান সাহিত্য' নামে যে অসাধারণ প্রবন্ধটি তিনি পাঠ করেন, তার ভাষা ও রচনা সৌন্দর্য্য, কাব্যিক উপমা, সর্বোপরি সুগভীর বোধের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা যে কোন মননশীল পাঠককেই চমৎকৃত করে— ''বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। সৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন।...বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটা উপেক্ষা করেন না।''

রবীন্দ্রনাথ এবং জগদীশচন্দ্রের পারস্পরিক পত্রমিতালী আজ বাংলা পত্র - সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। প্রথমে এই সম্পর্ক 'আপনি' দিয়ে শুরু হলেও অচিরেই তা 'তুমি'র অন্তরঙ্গতায় উত্তীর্ণ হয়। এই বন্ধুত্বের সূচনা হয় ১৮৯৭ সালে জগদীশচন্দ্র প্রথমবার বিলেত থেকে ফিরলে পরে। তখন তিনি কিছুদিনের জন্য ভগ্নীপতি আনন্দমোহন বসুর বাড়িতে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান, সেইসময় জগদীশচন্দ্র বাড়িতে না থাকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্য একটি ম্যাগ্‌নেলিয়া ফুল রেখে আসেন। দ্বিধাহীন কণ্ঠে কবি, জগদীশকে তাঁর 'প্রথম বন্ধু' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, ''ছেলেবেলা থেকে আমি নিঃসঙ্গ, সমাজের বাইরে

অবরোধের কোণে কোণে আমার দিন কেটেছে। আমার জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সাথে।" আর জগদীশচন্দ্র লিখেছেন, "তিন বৎসর পূর্বে আমি তোমার নিকট এক প্রকার অপরিচিত ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাকিলে। তারপর একটি একটি করিয়া তোমাদের অনেকের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। তোমাদের উৎসাহ - ধ্বনিতে মাতৃস্বর শুনিলাম।" রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে থাকতেন মাঝে মাঝেই জগদীশচন্দ্র সেখানে গিয়ে দু'একদিন কাটিয়ে আসতেন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "সন্ধ্যে হলেই উনি কবিকে ধরতেন, লেখা পড়ে শোনাতে হবে, কবিতা প্রবন্ধ কিছুই বাদ দেওয়ার উপায় ছিল না, কিন্তু জগদীশচন্দ্রের সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল ছোট গল্পে। আহারাদির পর শুরু হত গান।" জগদীশচন্দ্রের সত্তরতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কবি যে প্রশস্তিটি রচনা করেন, তা কবির 'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত—

"তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয়সন্ধ্যাকালে
কবি হাতে বরমাল্য সে-বন্ধু পরায়েছিল ভালে;
দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি—' পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।"

আর জগদীশচন্দ্র তার প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, "আমার সমুদয় চেষ্টার মধ্যে আমি কখনও সম্পূর্ণ একাকী ছিলাম না...আমার চিরবন্ধু রবীন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে ছিলেন। সেই সব সংশয়ের দিনেও তাঁহার বিশ্বাস কোনদিন টলে নাই।" প্রথম পরিচয়ের কালেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের মধ্যে একটি 'আলো' দেখেছিলেন। জগদীশচন্দ্র কখনও তা বিফল হতে দেন নি।

নোবেল পুরস্কার তিনি পান নি ঠিকই, কিন্তু প্রাপ্তির ঝোলা একেবারে শূন্যও ছিল না। ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.এস.আই.উপাধি (Companion of the order of the star of india) দেয় ব্রিটিশ সরকার। ১৯১৭ সালে পান নাইটহুড। ১৯২৭ সালে লাহোরের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের চতুর্দশ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৮ সালে ভিয়েনা অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স -এর সদস্য নির্বাচিত হন।

।। আট ।।

১৯৩৭ সালে যখন তাঁর আশিতম জন্মোৎসব পালনের তোড়জোড় চলছে, ঠিক আছে রবীন্দ্রনাথ সেই সভার সভাপতিত্ব করবেন, তার মাত্র সাতদিন আগে ২৩ শে নভেম্বর গিরিডিতে বাথরুমে পড়ে গিয়ে চোট পেলেন আচার্য। চিকিৎসার কোনরকম সুযোগ না দিয়ে সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে নিভে গেল জীবনদীপ। ৩০শে নভেম্বর সেই সভাই অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত থাকলেন অভিন্নহৃদয় সুহৃদ রবীন্দ্রনাথও। কিন্তু জন্মোৎসবের পরিবর্তে সেই সভাই হয়ে উঠল স্মরণসভা।

১৯০০ সালের জুলাই মাসে প্যারিস রওনা হয়েছিলেন বসুদম্পতি। সেইসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ২৩ অক্টোবরের দিনলিপিতে তিনি লিখেছেন, "এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র— এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী।...দেশ দেশান্তরের মনীষীগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরিধ্বনি আজ যার নাম উচ্চারণ করবে, সে তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি— এ জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ ইতালীয় প্রভৃতি বুধমণ্ডলী মন্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়?...সে বহু গৌরবর্ণ পন্ডিত মন্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন,— সে বীর জগৎ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে.সি. বোস। একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎ বেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভায় মুগ্ধ করলেন— সে বিদ্যুৎ - সঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিক - মন্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ — জগদীশ বসু— ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্যবীর!"

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের কাছে এক চিরবিস্ময়। কী পদার্থ বিজ্ঞানে কী উদ্ভিদবিজ্ঞানে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চায় তিনিই অগ্রপথিক। তাঁর আগে কেউ নেই। কিন্তু পরে অনেক মহিমাময় মুখের সারি। আজ জন্মের দেড়শ বছর পার হয়েও তিনি সমগ্র বিশ্বের কাছে সমান প্রাসঙ্গিক।

সূত্র সন্ধান

১। আকর গ্রন্থ
বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র ঃ প্রশান্ত প্রামাণিক (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী/১১ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা - ৭৯৯০০১

২। **সহায়ক গ্রন্থ**
জগদীশচন্দ্র ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়(প্যাপিরাস/২, গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০০০৮)

৩। সহায়ক প্রবন্ধ
ক) মার্কোনি একাই সেরা নন ঃ হরিসাধন চক্রবর্তী (গণশক্তি/ ০৭/১২/০৮)
খ) জগদীশচন্দ্র বসু ঃ স্মরণীয় - বিদিশা ঘোষ দস্তিদার (গণশক্তি/ ৩০/১১/০৮)
গ) আবিষ্কারের পুন ঃ আবিষ্কার ঃ হরিসাধন চক্রবর্তী (গণশক্তি/ ৩০/১১/০৮)
ঘ) বড়ো মানুষের চোখে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র ঃ - শ্যামল কুমার চক্রবর্তী (বিজ্ঞান মুখর জীবন/ শৈব্যা)
ঙ) Jagadish Chandra-ড. মৃত্যুঞ্জয় হাজরা